আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতরের খবর

আশীষ বাবলু

A prisoner of war is a man who tries

to kill you and fails, and then

asks you not to kill him.

- Winston Churchill

আমরা জানি শেষ নিঃস্বাস নেবার আগ মুহুর্তে বড় বড় ক্রিমিনালরাও মিথ্যা বলেনা, সত্য কথাটি বলে যেতে চায়। মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা জীবনের শেষ দিন গুলিতে একটা স্মৃতিকথা লিখেছেন। তিনি সন্তানদের বলেছেন বইটি যেনো তার মৃত্যুর পর প্রকাশ করা হয়। সন্তানেরা পিতার শেষ ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে গত বছর বইটি প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম 'এ্যা স্ট্রেনজার ইন মাই ওন্ কানট্রি '।

কে এই মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা ? বাংলদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই নামটি খুবই উল্লেখযোগ্য। ৭১এ শব-মাংসের ঘ্রান আর বারুদ মাখা রক্তাক্ত দিন গুলিতে খাদেম হোসেন রাজা ছিলেন (জি.ও.সি), জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ফরটিন ডিভিসন ইন ইস্ট পাকিস্তান। সেই সময় আমাদের দেশে অস্ত্রের মহিমায় যত রকম নৃশংস ঘটনা ঘটেছে তিনি হচ্ছেন তার প্রত্যক্ষদর্শী এবং অংশগ্রহনকারী (১৯৬৯ - ১৯৭১)।

ইয়াহিয়া খান সম্বন্ধে লিখেছেন, তিনি ছিলেন মোটা বুদ্ধি সম্পন্ন, কোন ডিপ্লোমেসি তা'র মোটা মাথায় প্রবেশ করতো না। প্রিয় ছিল হুইস্কি আর মেয়ে মানুষ। যে কয়টা দিন তিনি ঢাকায় থাকতেন তা'র জন্য প্রতি রাতেই নুতন নুতন মেয়েমানুষের ব্যাবস্থা করতে হতো। ১৯৭১এ ২৫ শে মার্চ তিনি যখন মাতাল অবস্থায় ঢাকা ত্যাগ করছিলেন তখন তিনি টিক্কা খানের ঘারে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'এদের সায়েস্তা কর, সর্ট দেম আউট '। অবশ্য জুলফিকার আলী ভুট্টোকে রেখে গিয়েছিলেন টিক্কা কি কি করছে তা নিজ চক্ষে দেখার জন্য।

ভুট্টো তা'র বেডরুমের জানলা দিয়ে দেখেছিলেন ঢাকা জ্বলছে, মানুষের বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার, ট্যাঙ্কের বিভৎস শব্দ, মেশিন গান আর গ্রেনেডের শব্দের সাথে রাস্তার কুকুরের আর্তনাদ। ২৬ শে মার্চ সকালে রক্তভেজা ঢাকার রাস্তায় কয়েকশত তাজা লাশ পেড়িয়ে তিনি কেন্টনমেন্টে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী ও আরবার খানকে। বললেন, সাবাস্, তোমাদের এই মহৎ কর্মের জন্য ভবিষ্যতে আমি তোমাদের পুরষ্কৃত করবো। তিনি কথা রেখেছিলেন, তার রাজত্বকালে এদের অনেক বড় বড় পদে অধিষ্টিত করা হয়েছিল। অর্থ সম্পদের অভাব তাদের সমস্ত জীবনে কোনদিন হয়নি।

টিক্কা খানের সাথে খাদেম হোসেন রাজার একটা ঠান্ডা লড়াই হয়েছিল শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে। টিক্কা খান চাইছিলেন শেখ মুজিবকে ঢাকার মাটিতে জনসমক্ষে ফাঁসি দেওয়া হোক। রাজা সেটা চাননি, তিনি চাইছিলেন ইষ্ট পাকিস্তানের মাটিতে এই সময় এমন একটা নাটক না ঘটুক। তিনি টিক্কাকে বোঝালেন মুজিবকে কি করা হবে সেটা পশ্চিম পাকিস্তানে ইয়াহিয়া আর ভুট্টোকে করতে দাও। তাকে সেখানেই পাঠিয়ে দাও।

হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট তা'র মতে ছিল হাজার মিথ্যার ব্যাসাতি। আওয়ামী লিগ বিদ্রোহ ঘোষনা করার পরই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মাঠে নামাতে হয়েছিল, অথচ একথা বলা হয়নি ইলেকশনে সংখ্যাগরিষ্টতা পাবার পরও তাদের ক্ষমতা কেন দেওয়া হয়নি ? তিনি লিখেছেন শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রেখেছিলেন, কিন্তু ইষ্ট পাকিস্তানের জনগন স্বাধীনতার জন্য রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। বিশষ করে ইষ্ট বেঙ্গল রাইফেল আমাদের আদেশ শোনার জন্য তৈরি ছিলনা। আমাদের বলতো 'শালা পাঞ্জাবী'।

জেনারেল ইয়াকুব খান ইয়াহিয়ার হাত ধরে বলেছিলেন ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লী বসতে দেওয়া হোক। ইয়াহিয়া তা'র কথা শোনেননি, শুনেছিলেন ভুট্টোর কথা। ইয়াকুব খানকে ইম্পেরিয়াল ডিফেন্স কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। টিক্কা খান ইষ্ট পাকিস্তানে অসামান্য কর্ম দক্ষতা দেখাবার কারনে তাকে পরবর্ত্তিতে বেলুচিস্তানে পাঠানো হয়, সেখানে তিনি মারী অধিবাসীদের গরু ছাগলের মত হত্যা করেন। বেলুচিস্তানের মানুষের কাছে তার পরিচিতি ছিল 'বুচার অফ বেঙ্গল' এই নামে।

খাদেম হোসেন রাজার লেখায় যার কথা আমরা সবচাইতে বেশী জানতে পারি, তিনি হচ্ছেন লেফটেনেন্ট জেনারেল আমির আব্দুল্লা খান নিয়াজী। লোকটা ছিল হারে হারামজাদা। অথচ মুখচোখ দেখলে মনে হতো ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে পারেননা।

রাজা লিখেছেন, একদিন অফিসারদের মিটিংএ নিয়াজী হাজীর হলেন, কোমরে পিস্তল হাতে সিগারেট। প্রত্যেক কথার সাথে ইষ্ট পাকিস্তানের মানুষদের তিনটে করে গালি, শালা শুয়রকা বাচ্চা, হারামখোর। এক পর্যায়ে বললেন বাঙ্গালী বাইনচোতেরা আমাকে চেনেনা, আমি এই জাতের রক্তের ধারা বদলে দেবো। আমার সেনাবাহিনীকে আমি লেলিয়ে দেবো, যতদিন এদেশের প্রত্যেকটি মহিলাকে ধর্ষন করা না হবে ততদিন আমার মনে শান্তি নেই। নিয়াজীর কথা শুনে উপস্থিত সবাই চুপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সেখানে উপস্থিত ছিল বাঙ্গালী এক অফিসার মেজর মোস্তাক।

খাদেম হোসেন রাজা লিখেছেন, পরদিন খবর পেলাম মেজর মোস্তাক কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স বাথরুমে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন।

পাকিস্তান থেকে আগত অফিসাররা ভাবতো সমস্ত ইষ্ট পাকিস্তান হচ্ছে একটা 'হীরামন্ডি' অর্থাৎ পতিতালয়। ইষ্ট পাকিস্তানের মাটিতে পা রেখেই জানতে চাইতো কোথায় মেয়েছেলে পাওয়া যাবে। নিয়াজীর কাছে থাকতো একটি ডায়রি, সেই ডায়রিতে থাকতো ঢাকার তথাকথিত উচ্চ পরিবারের মহিলাদের টেলিফোন নাম্বার। প্রায় প্রতি রাতেই তিনি টেলিফোন করে তা'র ভাষায় 'গার্লফ্রেন্ড'কে ডাকতেন। মখমলের মত রেশমী কোমর দুলিয়ে গার্লফ্রেন্ডরা এসে তার দড়জায় কড়া নাড়তো।

এই লম্পট নিয়াজীকে সবচাইতে বড় উল্লুক বানিয়ে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল ফর্জ রাফায়েল জ্যাকব, চিফ অফ্ আর্মি ষ্টাফ ইস্টার্ন কমান্ড।

১৪ই ডিসেম্বর দিল্লী থেকে আর্মি চিফ্ স্যাম ম্যানেকশ টেলিফোন করলেন জ্যাকবকে যশোহরে , 'জ্যাক্, কাল ঢাকায় গিয়ে নিয়াজীর সাথে দেখাকরে সারেনডারের ব্যাবস্থা কর'। জ্যাকব বললেন,- 'নিয়াজীর সাথে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে, আমাকে তার সাথে লাঞ্চে নেমতন্ন করেছেন। তবে সারেন্ডারের টার্ম কি হবে' ? ম্যানেকশ বললেন- 'সেটা লেখা হচ্ছে সেটা সময় মতো তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।

জ্যাকব তবু নিজের মত একটা সারেন্ডারের খসরা নিজে লিখে টাইপ করিয়ে নিলেন। পরদিন যশোহর থেকে যখন হেলিকপ্টারে উঠবেন ঢাকার উদ্দেশে তখন একজন অফিসার ছুটে এসে তার হাতে একটা ইনভেলপ তুলে দিলেন। হেলিকপ্টার আকাশে উড়লো। হাতের ইনভেলাপ খুলে পড়ে দেখছিলেন কি টার্মস এন্ড কন্ডিশন লেখা হয়েছে । ওমা! কাগজে মাত্র দুই লাইন লেখা। *গভরমেন্ট অব ইন্ডিয়া হ্যাজ এ্যাপ্রুভড অফ জেনারেল জ্যাকব হ্যাবিং লাঞ্চ উইথ্ লেফটেনেন্ট জেনারেল নিয়াজী।* জ্যাকব ভাবলেন আমিতো লাঞ্চ খেতে যাচ্ছিনা, যাচ্ছি সারেন্ডার করাতে। পকেটে নিজের লেখা সারেন্ডারের কাগজটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলেন, হ্যাঁ, ওটা ঠিক জায়গায়ই আছে।

তখন ঢাকায় মুক্তি বাহিনী ও পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ চলছে। থম থমে ঢাকা। চিন্তিত বাংলাদেশ। এরপর কি হবে ? কী হতে যাচ্ছে ? এয়ার পোর্টে জেনারেল জ্যাকবের হেলিকপ্টার এসে নামলো। তাকে রিসিভ করলেন একজন পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার। দুজনে রওনা হলেন পাকিস্তানি আর্মির একটা জিপে, গন্তব্য নিয়াজীর হেটকোয়ার্টার। কিছুটা পথ পেরোতেই একঝাক গুলি এসে লাগলো জিপে। জ্যাকব জিপ থেকে লাফদিয়ে সোজা রাস্তায়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি জিপ দেখে এ্যাটাক করেছে। জ্যাকবের গায়ে জলপাই রং এর পোষাক, একজন মুক্তিযোদ্ধা একটা ভাঙ্গা বাড়ী থেকে বেড় হয়ে এলেন। গাড়ির ভেতর পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ারকে দেখে জ্যাকবকে বললেন-ওকে আমাদের হাতে দিয়ে দিন। অনেক বুঝিয়ে সে যাত্রায় পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ারকে রক্ষা করলেন জ্যাকব। সেখান থেকে সোজা নিয়াজীর অপিস।

অপিসে নিয়াজী বসে আছেন, সাথে রাও ফরমান আলী ও আরো কয়েক জন। জ্যাকব পকেট থেকে তার লেখা সারেন্ডারের কাগজ খানা গড় গড় করে পড়ে শুনালেন। নিয়াজী চেঁচিয়ে উঠলেন,-‘ কি সারেন্ডার ? আপনি এখানে এসেছেন যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনা করতে। অথচ বলছেন আমাদের আন্‌কন্ডিশনাল সারেনডার করতে ’?

জ্যাকব বললেন,-জেনারেল দিস ইজ নট আন্‌কন্ডিশনাল। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার সমস্ত সৈন্যদের, পরিবার পরিজনদের জেনেভা কনভেনশনের নিয়মে রক্ষা করা হবে।

নিয়াজী তখনও উচ্চস্বরে কথা বলে যাচ্ছেন, সাথে গলা মেলাচ্ছেন রাও ফরমান আলী।

জ্যাকব বললেন, যদি সারেন্ডার না করেন তবে আপনাদের নিরাপত্তা আমরা দিতে পারবোনা।

নিয়াজীর গলা তখনও উচ্চ গ্রামে, হাউ দিস ইজ পসিবল, নো ওয়ে, ইয়ে কভি নেহি হো সাক্‌তা।

জ্যাকব সোজাসুজী নিয়াজীর চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,-‘দেখুন জেনারেল, আমি এর চাইতে অন্য কোনো টার্ম দিতে পারবোনা। প্লিজ থিং ইট ওভার। আমি আপনাদের ৩০মিনিট সময় দিচ্ছি। যদি রাজি না হন তবে আমরা যুদ্ধ শুরু করবো এবং এই ক্যান্টনমেন্টে বোম্ব ফেলার অর্ডার দিতে বাধ্য হবো। এই বলে জ্যাকব ঘট ঘট করে ঘর থেকে বেড় হয়ে এলেন।

বাইড়ের করিডোরে জ্যাকব পাইপ ধড়ালেন। ঐ সময়টায় আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস কলম হাতে থমকে গিয়েছিল। এর পর কী লেখা হবে ? আরো রক্ত, আরো মৃত্যু নাকি অন্যকিছু ! জ্যাকব তা‘র বইতে লিখেছেন এই ত্রিশ মিনিট ছিল তার জীবনের দীর্ঘতম ত্রিশ মিনিট। ঘড়ির কাঁটা যখন ঠিক ত্রিশ মিনিটে পৌছালো জ্যাকব ফিরে গেলেন নিয়াজীর ঘরে।

ঘরে তখন কবরের নীরবতা। টেবিলে তখনো ছড়ানো এগ্রিমেন্ট পেপারস্। জ্যাকব বললেন, জেনারেল ডু ইউ এক্সেপ্ট দিজ ?

নিয়াজী কোনো উত্তর দিচ্ছেননা।

জ্যাকব আবার বললেন, জেনারেল ডু ইউ এক্সেপ্ট দিজ ?

এবারও কোন উত্তর নেই।

জ্যাকব তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, জেনারেল ডু ইউ এক্সেপ্ট দিজ ?

নিয়াজী তখন এক দৃষ্টে ঐ এগ্রিমেন্টস পেপারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। তা'র দু'চোখ দিয়ে ঝড়ে পড়ছে অশ্রুবিন্দু। জ্যাকব টেবিলের কাগজ একত্র করতে করতে বললেন, 'আই টেইক ইট এ্যাজ এক্সেপটেড'।

উপস্থিত রাও ফরমান আলী সহ অন্যান্য সবার চোখে তখন কসাইয়ের চাকুর মত উদাসীনতা।

জ্যাকব এবর নিয়াজীকে বললেন, জেনারেল এখন আমি আপনার সাথে দুই একটা কথা বলতে চাইছি। আপনি সারেন্ডার করবেন জনসাধারনের সামনে। নিয়াজী আৎকে উঠলেন, 'না আমি সারেন্ডার করবো আমার অপিসে'।

জ্যাকব দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'না, আপনি সারেন্ডার করবেন ঢাকার মানুষদের সামনে। আমি আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছি রেসকোর্সের মাঠে সারেন্ডারের ব্যাবস্থা করতে'। নিয়াজী এবার একদম চুপ।

জ্যাকব বললেন, ' আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে। সারেন্ডারের আগে ইন্ডিয়ান আর্মি ও মুক্তি বাহিনীকে আপনার সৈন্যদের দিয়ে গার্ড অব অনার দিতে হবে'। একথা শুনে নিয়াজীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা, বললেন,'আমার কাছে এখন গার্ড অব অনার দেবার মত কোনো কমান্ডার নেই'।

জ্যাকব আঙ্গুল তুলে নিয়াজীর এ,ডি,সি কে দেখালেন, হি উইল কমান্ড ইট। এই বলে জ্যাকব হেডকোয়ার্টার থেকে বেড়িয়ে এলেন।

এখানে যে কথাটা বলার সেটা হচ্ছে তখন ঢাকায় নিয়াজীর অধিনে ছিল ৩০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য। পাকিস্তানি সৈন্য চারিদিকে গিজ গিজ করছে। ভারতীয় সৈন্য ছিল মাত্র তিন হাজার আর ছিল হাজার দুই মুক্তি যোদ্ধা। তখন ইউনাইটেড ন্যাশনের অধিবেশন চলছে। আমেরিকা ভীষণ ভাবে চাপদিচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী ইষ্টপাকিস্তান থেকে সরিয়ে নিতে। আর তিন দিন যদি পাকিস্তান যুদ্ধ চালাতে পারতো তবে ইউ.এন.ও. এর আদেশে যুদ্ধ বিরতীই হতো, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস অন্যভাবে লেখাহতো, আরো রক্ত, আরো নৃশংসতা দিয়ে।

হামিদুর রহমান কমিশন নিয়াজীকে প্রশ্ন করেছিল, ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিন থেকে পাঁচ হাজার সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পন করতে হলো কেন ? উত্তরে নিয়াজী বলেছিলেন, জ্যাকব আমাকে ব্লাফ দিয়েছে, ব্লাকমেইল করেছে।

১৬ই ডিসেম্বর লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরা হেলিকপ্টারে ঢাকা এয়ার পোর্টে নামলেন। অভ্যর্থনা জানালেন নিয়াজী নিজেই। আশ্চর্য হবার ব্যাপার অরোরার সাথে এসেছেন তা'র স্ত্রী। ঢাকার বাতাসে তখন বারুদের

গন্ধ, শহরটার উপর যদিও শীতের নীল আকাশ তবুও বড় অনিশ্চিত, অসংখ্য ছড়ানো ছিটানো অস্ত্র, কে কোথা থেকে গুলি ছোড়ে কিচ্ছু বলা যায়না। মিসেস অরোরা এর মধ্যে সাহস করে ঐতিহাসিক সারেন্ডারের দৃশ্য নিজ চক্ষে দেখার জন্যে চলে এসেছেন। জেনারেল ওসমানীকে আনবার জন্য সিলেটে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছিল, তিনি আসেননি। তবে সেইদিনটিতে ওসমানীর উপস্থিতির খুবই প্রয়োজন ছিল।

তবে কয়েক ট্রাক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে হাজির হয়েছিল ছিপ ছিপে একটি ছেলে। মাথায় ঝাক্‌রা চুল, এক মুখ দাড়ি, পড়নে মিলিটারী শার্ট প্যান্ট, শার্টের উপর ব্যাজ - মেজর জেনারেল। ছেলেটি আর কেউই নয়, কাদের সিদ্দিকি। অকুতভয় বঙ্গবীর বাঘা সিদ্দিকি। সবাই মিলে তারা রওয়ানা হলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেখানে মঞ্চ আগেই তৈরি করা হয়েছিল। স্লোগান আর চিৎকারে মুখরিত ময়দান। কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী জমা হয়েছে অত্যাচারী পাকবাহিনীর প্রতি ঘৃনা জানাতে। আর জয় বাংলা চিৎকারে ঢাকা তখন টগবগ করছে। এত উচ্ছাস কখনো দেখেনি কেউ। পাকিস্তানি সৈন্যরা গার্ড অব অনার দিলেন বিজয়ী মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডারদের।

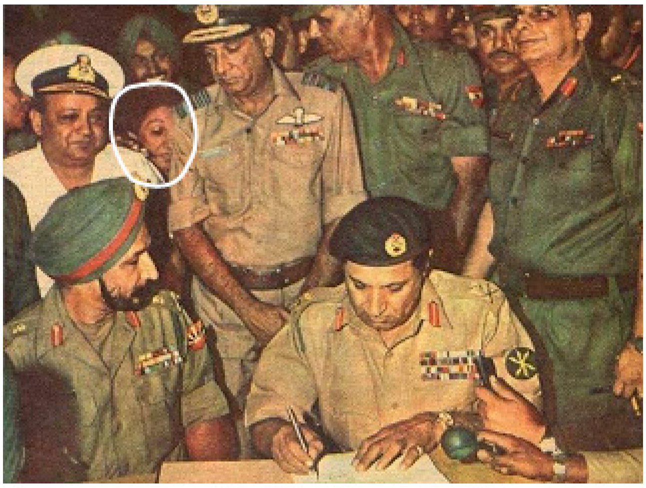

ভিড়ের মধ্যে যে মহিলা উঁকি দিচ্ছেন তিনি মিসেস অরোরা

এরপর নিয়াজী ও অরোরা বসলেন পাশাপাশি। এখানে আরেকটি চেয়ারে বসার কথা ছিল জেনারেল ওসমানীর। আত্মসমর্পনের দলিলে লেখাও ছিল, ভারত বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পন করছে পাকবাহিনী। যা নিয়ে পাকিস্তানিরা আপত্তিও জানিয়েছে, তবে সেই আপত্তি ধোপে টেকেনি। সাক্ষরিত হলো আত্মসমর্পনের দলিলঠ। সেই দলিলটি আবার নতুন করে কলকাতায় সাক্ষর করা হয়েছিল । কেননা সময়টা ছিল দুপুর ৪.৩১মিঃ, কিন্তু ভুল করে লেখা হয়েছিল ৪.৫৫মিঃ। নিয়াজী তা'র কাধেঁর মেডেল খুলে রাখলেন টেবিলে। রিভালভার বের করে তুলে দিলেন অরোরার হাতে। এখানে নিয়াজী একটা চাল চেলেছিলেন, যে রিভালভারটি তিনি অরোরাকে দিয়েছিলেন সেটা নিয়াজীর নিজেস্ব ছিলনা। জং ধরা রিভালভারটির নল ছির ময়লায় ভরা। যদিও তাতে কিছুই যায় আসেনা, রিভালভার তুলে দেওয়াটা হচ্ছে একটা সিম্বল, সেটা জং ধরাই হোক কিংবা চক্‌চকে্।

রিভালবার তুলে দেবার সাথে সাথে জন্ম নিল বাংলা নামে দেশ। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠলো নিয়াজির ফাঁসী চাই, রেজাকার, আলবদরদের ফাঁসি চাই। সেই থেকে গত ৪২ বছর ধরে বাঙ্গালী সেই একই শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে, আরো কত বছর দিতে হবে কেউ জানেন।

নিয়াজী সহ সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারদের জিপে তোলা হলো। তা'রা সবাই বেশ রিলাক্স ভঙ্গিতে জিপে গিয়ে উঠলেন। যেনো এইমাত্র টুয়েন্টি টুয়েন্টি ক্রিকেটে হেরে বাসায় ফিরছেন। সারেন্ডার বা আত্মসমর্পন কোনো নতুন ঘটনা নয়। ইতিহাসে অনেক সারেন্ডার হয়েছে। এখানে কয়েকশ অফিসারের সাথে নব্বই হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পন। এদের যদি বিবেক বলে এতটুকু বস্তু থাকতো তবে দু'একজন জেনারেলের আত্মহত্যা করার কথা ছিল। পৃথিবিতে যত সারেন্ডার হয়েছে তার সাথে যোগ হয়েছে বিবেকের তারনায় আত্মহত্যা করার ইতিহাস। এখানে তেমন কিছুই হলোনা। অবশেষে তাহারা পাকিস্তানে ফিরিয়া মহাআনন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন।

ashisbablu13@yahoo.com.au